হুগলী উইমেন্স কলেজ

বিবেকানন্দ রোড, পিপুলপাতি, হুগলী

দিশারী

কলেজ পত্রিকা
২০২২-২৩

দিশারী

২০২২-২৩

হুগলী উইমেন্স কলেজ

পিপুলপাতি, হুগলী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে এবং ইউ.জি.সি. অনুমোদিত

Ph. No. : 033-26805033 (Office)

E-mail : hooghlywomenscollege@gmail.com

Website : hooghlywomenscollege.org

দিশারী

বার্ষিক পত্রিকা ঃ ২০২২-২৩

ঃ প্রকাশনা কমিটি ঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শ্রী অসিত মজুমদার, সভাপতি
পরিচালন সমিতি, হুগলী উইমেন্স কলেজ

উপদেষ্টা

ড. সীমা ব্যানার্জী
অধ্যক্ষা, হুগলী উইমেন্স কলেজ

সম্পাদিকা মণ্ডলী

কোয়েশী চ্যাটার্জী — রূপসা রায়
অনুষ্কা সরকার — সুস্মিতা সাহা
অঙ্কিতা ঘোষ — তিয়াসা দত্ত

সহযোগিতায়

অধ্যাপিকা কবিতা দে — অধ্যাপক ড. নির্মাল্য সেনশর্মা
অধ্যাপিকা ড. নন্দিনী মুখোপাধ্যায় — অধ্যাপিকা ড. স্বপ্না দাস
অধ্যাপিকা ড. জনা বন্দ্যোপাধ্যায় — অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী

মুদ্রণে

সৌপর্ণ উদ্যোগ
২/৪৪এ, যতীনদাস নগর
বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬

শ্রদ্ধার্ঘ্য

গত বছর
যাঁদের হারিয়েছি...

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE

(Govt. Sponsored)
P.O. & Dt. Hooghly, Pin - 712103, W.B.
[Accredited "B" by NAAC, Bangalore]

Ph. : 2680-2335 (Principal)
2680-5033 (Office)

MESSAGE

I am glad to know that Hooghly Women's College is going to publish its Annual Magazine for the Academic Session 2022-23. I appreciate the efforts of the college for publishing the magazine.

On this occasion, I convey my heartiest congratulations to the Principal, faculty members, staff and students of the collge.

I wish the magazine to be a grand success.

PRESIDENT
GOVERING BODY
HOOGHLY WOMEN'S COLLGE

PRESIDENT
GOVERNING BODY
HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE
(Govt. Sponsored)
P.O. & Dt. Hooghly, Pin - 712103, W.B.
[Accredited "B" by NAAC, Bangalore]
Ph. : 2680-2335 (Principal)
2680-5033 (Office)

অধ্যক্ষার শুভেচ্ছা

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'দিশারী' প্রকাশিত হতে চলেছে। এতে ধরা রয়েছে আমার স্নেহের ছাত্রীদের সৃষ্টি, নানা রূপে রঙে রসে রেখায়। এ ধরনের পত্রিকায় লেখার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে ছাত্রীদের সুপ্ত সাহিত্য-প্রতিভা। আজ 'দিশারীর' পাতায় ধরা রয়েছে যে ছাত্রীদের সৃষ্টি, তাদের মধ্যে থেকেই একদিন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতের নামী লেখিকাকে। ছাত্রীদের ছাড়াও এ পত্রিকায় রয়েছে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক -শিক্ষিকার লেখা।

যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতোই মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। 'দিশারীর' মাধ্যমে আমাদের ছাত্রীদের স্বপ্ন ভাষারূপে সাহিত্যের সৃজনী - ধারায় এগিয়ে চলুক। পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। শিক্ষক - শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা, ছাত্রীদের জন্য রইল স্নেহাশীর্বাদ।

সীমা ব্যানার্জী

ড. সীমা ব্যানার্জী
অধ্যক্ষা
হুগলী উইমেন্স কলেজ

সম্পাদকীয়

প্রত্যেক বছরের মত এ বছরেও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বহু আকাঙ্ক্ষিত বার্ষিক পত্রিকা 'দিশারী' প্রকাশিত হচ্ছে। ছাত্রীদের সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার প্রকাশ ঘটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে। এর মধ্যে দিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে শিক্ষার্থীদের। ছাত্রীদের ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটে পত্রিকার পাতায়। কবিতা-গল্প প্রবন্ধ-ছবি ইত্যাদি বিভিন্ন ধারাকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায় তাদের মনের জগৎ। শ্রদ্ধেয়া অধ্যক্ষা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মিবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা, আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে। আশা রাখি, আগামী দিনেও তাদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা, স্নেহাশীর্বাদ পাব নিরন্তর।

ধন্যবাদান্তে

কোয়েশী চ্যাটার্জী	রূপসা রায়
অনুষ্কা সরকার	সুস্মিতা সাহা
অঙ্কিতা ঘোষ	তিয়াসা দত্ত

কিছু কথা

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ৭৫ বছর ধরে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে আমাদের সবার প্রিয় 'হুগলি উইমেন্স কলেজ'। অধ্যক্ষা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মী বন্ধু আর ছাত্রীরা সবাই মিলে আমরা এক সুখী সুন্দর পরিবার। পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিকে রয়েছে আমাদের ছাত্রীদের আগ্রহ ও কৌতূহল। সৃজনী শিল্পের নানা ধারায় তারা নিজেদের মেলে ধরে, দেখা যায় তাদের প্রতিভার স্ফুরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্রীদের ধারাবাহিক সফলতার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় তাদের কৃতিত্ব আমাদের গর্বিত করে। সারস্বত-সাধনার যেকোনো প্রতিষ্ঠানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের পত্রিকা। যার মধ্যে বিভিন্ন লেখায় প্রতিফলিত হয় শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা, তাদের মনের আকাশ- 'হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ' ('সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ- 'সাহিত্য' গ্রন্থ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। সাহিত্যের মধ্যে মানবহৃদয়ের অন্তহীন বিচিত্র প্রয়াস দেখা যায় নিজেকে সৃজন করার।

প্রকাশিত হতে চলেছে 'দিশারী', আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা । পত্রিকা প্রকাশে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন মাননীয়া অধ্যক্ষা ড. সীমা ব্যানার্জি। 'দিশারী'র ডালি সাজানো হয়েছে প্রধানত ছাত্রীদের লেখায়, পাশাপাশি রয়েছে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেরও কিছু লেখা।

পত্রিকার মূল প্রাণকেন্দ্র আমাদের ছাত্রীরাই। ওরাই পত্রিকার কাজটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা কিছুটা সাহায্য করেছি, এগিয়ে চলার পথে কিছু পরামর্শ দিয়েছি। পত্রিকায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও, এ প্রয়াস আন্তরিকতা দিয়ে গড়া।

কবিতা দে নির্মাল্য সেনশর্মা
নন্দিনী মুখোপাধ্যায় স্বপ্না দাস
জনা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বনাথ মুখার্জী

সূচীপত্র

❋ নিষ্ঠুর ১লা মার্চ	অধ্যাপিকা মঙ্গলা ঘোষ রায়	১৭
❋ অপেক্ষা	বিথিকা রায়	১৮
❋ বিজয়ার টিপ	সংযুক্তা চ্যাটার্জী	১৯
❋ মুক্তির খোঁজে	ঈশিকা দাস	১৯
❋ পাওয়া	ড. দেবব্রত অধিকারী	২০
❋ বাবা	সুপর্ণা বিশ্বাস	২০
❋ প্রযুক্তির প্রগতি	কাবেরী ঘোড়াই	২১
❋ মোমবাতি	মুন কোলে	২১
❋ আমি চললাম	অর্পিতা মণ্ডল	২১
❋ নীরার স্মরণসভা	অধ্যাপক সত্যজিৎ বিশ্বাস	২২
❋ কন্যাশ্রী	হোসেনা খাতুন	২২
❋ অবেলা	ড. জনা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩
❋ বিচ্ছেদ	অঙ্গনা ঘোষ	২৩
❋ আজ বলবো, মায়ের কথা	নবনীতা মিত্র	২৪
❋ অচেনা বন্ধু	জিনিয়া সুলতানা	২৫
❋ নকলনবিশ পশুপাখি	অনুষা ঘোষ	২৭
❋ শেষ মুহূর্ত	নন্দনী গুপ্তা	২৯
❋ আমার স্বপ্নপূরণ	শ্রীদিশা ভট্টাচার্য্য	৩০
❋ হালদার পরিবারের মা দুর্গার পূজার ইতিহাস	উৎসা সাধু	৩২
❋ Screaming	Pratishruti Bhattacharya	৩৪
❋ Women, Rights and Empowerment	Prof. Kabita Dey	৩৫
❋ Persuasion & Popular Media	Satavisha Nandy	৩৭
❋ মধুসূদনের জীবন ও সৃষ্টি ঃ জন্ম দ্বিশতবর্ষের আলোকে	ড. নির্মাল্য সেনশর্মা	৩৮

নিষ্ঠুর ১লা মার্চ

অধ্যাপিকা মঙ্গলা ঘোষ রায়
(সম্পাদিকা, শিক্ষক সমিতি, ২০১০-২০১২)

পারি না মানতে তুমি নেই সুকান্ত,
মৃদুভাষী, হাল্কা হাসি, সৃজনশীল মন
পিছু টানে মোরে, তাই ফিরি বারে বারে
স্মৃতির আধারে সর্বক্ষণ, মুদিলে নয়ন
তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি কলেজের অন্দরে
বাহিরে, মনে ভাবি এই আছো, এই ছিলে
কিন্তু কই ? কোথায় ? কখন ?

তোমার অবাধ বিচরণের কর্মক্ষেত্র যেন
প্রতিক্ষণ তোমারই প্রতীক্ষায়, জীবনের
মায়াজালে মিথ্যে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াই।
জানি না পৃথিবীর অপর প্রান্তে কোন অদৃশ্য
বন্ধনে তুমি বাঁধা, প্রার্থনা করি তুমি
ভালো থেকো, ভালো রেখো তোমার স্বজনদের।

নিরলস কর্মক্লান্ত, তুমি ছিলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
তোমার প্রাপ্য ছিল উষ্ণ সম্বর্ধনা, দুর্ভাগ্য
আমাদের, নিয়তির বক্রহাসি এক লহমায়
পৌঁছে দিল সকলকে স্মৃতিচারণের কাঠগড়ায়।
আমরা কি পারব কোনদিন ২০১১-র
১লা মার্চকে ক্ষমা করতে ?

[রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকান্ত গাঙ্গুলীর অকাল প্রয়াণে (১লা মার্চ, ২০১১), ঐ বছর কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠানে এটি পঠিত হয়।]

অপেক্ষা

বিথিকা রায়
বাংলা বিভাগ, অনার্স, ষষ্ঠ সেমেস্টার

মাফ করো, তুমি ছাড়া আমি ভালো নেই,
পৃথিবীর নিকষ কালো অন্ধকার আমাকে টানে,
বলতে পারো একরাশ উজ্জ্বলতা পাব কোনখানে ?

ভেসে যাওয়া সাদা মেঘে আমি তোমায় খুঁজি,
ভোরের ফোটা আলোয় আমি তোমায় খুঁজি,
কখনো বা মাঝরাতে চমকে উঠে তোমায় খুঁজি,
কিন্তু পাই না- জানলা দিয়ে চোখে পড়ে ল্যাম্পপোস্টের আলোটায়
বিষণ্ণ হয়ে যায় চারিদিক।
বুকটা হাহাকার রবে চিৎকার করে বলে
নেই, নেই, কেউ নেই
এই ছন্দে ঝিল্লির ডাক তালিম দেয়।

আমি পুনরায় ঘুমানোর চেষ্টা করি-পরমুহূর্তেই দেখি
আমার একপাশে ক্লান্ত সেই অন্ধকার আরেক পাশে
প্রচণ্ড তেজালো আগুন, যা আমার শরীরটাকে দগ্ধ করে,
পুড়িয়ে ফেলে, আমি পুড়ি, কিন্তু মরি না,
তোমার স্মৃতির ভাণ্ডার সাক্ষী করে বেঁচে থাকি।

পৃথিবীর আলো আমায় স্পর্শ করে না,
ব্যাপক ভিড়ের কোলাহলেও আমি বধির,
যে জনবিরল দ্বীপে নির্বাসিত করেছ-সেখান থেকে
কোনোদিন কি ফিরিয়ে নেবে না আমায় ?
কোনোদিন কি আমি পারব না আমাদের সংসারে ফিরতে ?
নাকি ভুলের শাস্তি স্বরূপ আবার দ্বীপান্তরিত হবে এ প্রাণ ! !

চুপ করে থেকো না উত্তর দাও, উত্তর দাও
অন্যথায় কাছে ফিরিয়ে নাও,
ক্ষমা করো, ভালো নেই আমি তুমি ছাড়া।

বিজয়ার টিপ

সংযুক্তা চ্যাটার্জী
প্রথম সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

মেনকা ঃ- যাস নে রে উমা মা
যাস নে মাকে ছেড়ে
ছিলি তো মোটে চারটে দিন
এতেই যাবি ফিরে !
তোর আগমনে যে ঘরখানি
ভরে উঠেছিল আলোয়
সে ঘর আবার শূন্য হবে,
পূর্ণ হবে কালোয়।
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ
নাতি নাতনি নিয়ে কদিন ছিলেম বেশ
সহ্য হোল না তার !
কি জানি কবে মুখখানি তাদের
দেখতে পাব আবার।
ভয় লাগে মা, হয় আশঙ্কা
হয় বড্ডো দুশ্চিন্তা,
পরের বছর সে যদি তোদের
আসতে না দেয় হেথা !
উমা ঃ- কেঁদো না গো মা
ভেবো নাকো এত,
তোমার উমা আসবে আবার
প্রতি বছরের মতো।
আমি যেমন তোমার চোখের মণি
তেমনি তো ও জগতেরও জননী,
সন্তানেরা মাকে ছেড়ে
কদ্দিনই বা থাকতে পারে ?
বাছারা মোর গুণবে যে দিন
থাকবে মোর প্রতীক্ষায়,
মাগো, তুমি পেয়ো না কষ্ট
দাও এবারে বিদায়।
তাছাড়া মা আর কটা দিন বাকি !
তারপরেই তো তোমার ঘরে
আসবে মা লক্ষ্মী।
বাজবে আবার খুশির সানাই
জ্বলবে আশার দীপ,
বিদায়কালে পরাই তোমায়
বিজয়ার এই টিপ।

মুক্তির খোঁজে

ঈশিকা দাস
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

মায়ায় জর্জরিত যেন সে এক রুগ্‌ণ শরীর,
মায়া ? কেবলই কী মায়া ?
না তার মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত
অজানা অচেনা না বুঝতে পারা এক মারণ রোগ।
যা তাকে মারছে তিলে তিলে, ভেতর থেকে
দুমড়ে মুচড়ে রেখে দিচ্ছে, পুরো মানুষটাকে
মানুষটা আসলেই, অনেক বাঁচতে চেয়েছিল
বাঁচার আশায়, খাচ্ছিল মুঠো মুঠো ওষুধ
ওষুধ গুলো যেন, তার কাছে ছিল অমৃত
তবুও সে হেরে গেলো, হেরে গেলো
বিধাতার বিধানের কাছে।
হেরে গেলো সে তার জ্বলন্ত মারণ রোগের কাছে।
অবশেষে এক বুক ভরা কষ্ট, জলন্ত শরীর,
মান-অভিমান, মায়া ভালোবাসা
সব কিছু ত্যাগ করে সে চলে গেলো
শেষ করে দিলো নিজেকে
হতাশার সাথে চিরতরে
গা ভাসালো নিজেই তারাদের দেশে
মুক্তির খোঁজে।

পাওয়া

ড. দেবব্রত অধিকারী
অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

যখন দুঃখেরা
চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়,
তখন সুখেরা কি
গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে,
কিংবা মেঘের আড়াল থেকে
উঁকি দেয়,
ইন্দ্রজিৎ-বধের পালা দেখতে?
সায়াহ্নবেলাতে মানুষের মন
পার্থিব থেকে
অপার্থিব হয় কি?
ডাস্টবিনে আবর্জনার স্তূপে,
একটা কাক
এককণা খাবারের টুকরো
মুখে নিয়ে নিস্তব্ধ, নিশ্চুপে
আরো পাবার আশায় দিন গুণছে-
বরফের টুকরো গলে
জল হয়ে যায়,
মানুষের রাগ তবু
কমে না,
কুকুরগুলো রাস্তার মোড়ে,
একটা হাড়ের টুকরো নিয়ে
কামড়াকামড়ি করে মরে।
অনেক কষ্ট করে
অবশেষে যখের ধন পাওয়া,
শান্তি-

বাবা

সুপর্ণা বিশ্বাস
প্রথম সেমেস্টার

বাবা তুমি আমায় ছেড়ে গেছ
অনেক দূরে,
এই জীবনে তোমায় আমি
কোথায় পাব ফিরে?
তুমি বাবা আমায় ছেড়ে কোথায় গেছ
আকাশের ওই ছোট্ট তারা হয়ে
জানি না বাবা তুমি কি আসবে
আবার ফিরে?
বাবা, তুমি আমায় ছেড়ে
গেছ অনেক দূরে।

তুমি বাবা আমার কাছে
আসবে আবার কবে?
আমার বাবা কি শুধুই আমার
মনের মাঝে রবে?
জানি না বাবা তুমি এখন
কোথায় কেমন আছো?
যেখানেই থাকো বাবা
তুমি আমায় ভালোবাসো।।

প্রযুক্তির প্রগতি

কাবেরী ঘোড়াই
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তির ওপর
ভীষণই নির্ভরশীল
তবে এর বাইরেও এক পৃথিবী আছে,
যেখানে শান্তি অনাবিল।

আমরা পাঠ্যপুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি
বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়েছে ভারী।

সেই সময় ও তো কবি, লেখক, মনীষীরা
জ্ঞান অর্জন করেছিলেন পাঠ্যপুস্তক পড়ে
এ প্রজন্মে শিক্ষার্থী সহ অন্যান্যরা
রয়েছে প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে।

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং বিভিন্ন অনলাইন গেমের ফলে
বেশিরভাগ মানুষই ছেড়েছে বই পড়া, লেখালিখির হাল
মনে রেখো বর্তমান প্রজন্ম দাঁড়িয়ে এ হালে
পাঠ্যপুস্তকই ফিরিয়ে আনবে তাদের জীবনের গতি-কাল।

যারা কম্পিউটার, ফোন, অন্যান্য প্রযুক্তির আবিষ্কর্তা
তারা কিন্তু এ পাঠ্যপুস্তক পড়েই হয়েছে এর সৃষ্টিকর্তা।

এই ধরো কোনো ক্ষেত্রে করি প্রযুক্তির ব্যবহার
তবে, থেকে যেন কোন ক্ষতি না হয়
সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার।

হ্যাঁ জানি, প্রযুক্তি আমাদের যে কোন কাজ
সহজতর করে তোলে
তবে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার
বিপদ না ঘনিয়ে আসে কোনো কালে।

তবেই তো সঠিক ভাবে হবে প্রযুক্তির প্রগতি
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখবে আমাদের দেশের অগ্রগতি।

আমি চললাম

অর্পিতা মণ্ডল
এডুকেশন বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

ওই দূরে তাকিয়ে দেখ,
আকাশ যেন হাসছে.....।
আরো দূরে তাকিয়ে দেখো,
পাখিরা গান গাইছে.....।

তুমি চুপ কেন, কথা বলো,
আরে চুপ করে ওদের গান শোনো।
দূরে কোথাও ঘুরে আসি চলো....
সেই অপেক্ষায় তুমি দিন গোনো।

মোমবাতি

মুন কোলে
বাংলা, পঞ্চম সেমেস্টার

টপ টপ জল ঝরে,
কেঁদে কেঁদে সারা।
আলো দিয়ে আঁধারেতে
নিজে হয় হারা।।

বিদ্যুতেরে ভালোবেসে
তার যত দায়,
বুক ভরা আলো দিয়ে
শোধ করে যায়।।

নীরার স্মরণসভা

সত্যজিৎ বিশ্বাস
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

নীরা তখন সবে ছুঁয়েছে, আঠেরো কি উনিশ
কলেজে ঢুকে কোন ক্লাসই, করে না সে মিস্।
চোখ-ভরা যে স্বপ্ন ওর, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস,
অনেক আড্ডা, অনেক গল্প, তারই সঙ্গে ক্লাস।

বাড়ি নীরার কলেজ থেকে অনেকটাই দূর,
অগত্যা তাই হোস্টেলে, বেঁধেছে নতুন সুর।
রোজের সাড়ে-দশের প্রার্থনায়, এখন যে তার ছুটি
টিফিনে আর নেয় না, আধ-পোড়া সেই রুটি।

এভাবেই কাটে যে তার, পাঁচটি সেমেস্টার
নীরা তখন কলেজের, ক্লাস-মনিটর।
হোস্টেলে সবার মাঝে, নীরা যেন একা
পড়াশেষে মুঠোফোনে, চলে স্বপ্ন আঁকা।

দূরভাষে পরিচয়, শেষে শুরু প্রণয়
নীরার জীবন এখন যেন, দারুণ ছন্দোময়।
মুঠোফোনে হাসি-গল্প, আরও অনেক কথা
প্রলেপ লাগায়, কাটিয়ে তোলে জীবনের সব ব্যথা।

গভীর থেকে গভীরতর, স্বপ্নে জীবন ভরা
দুটো জীবন যেন একাকার, স্বপ্ননীল আর নীরা।
এভাবেই কেটে যায়, তিন-তিনটে বছর,
হঠাৎ করেই ভাঙল যেন, নীরার স্বপ্ন-ঘোর।

মুঠোফোনে চমকে দেখে, নিজের নীলছবি
মাথায় যেন অশনিপাত, হারিয়ে গেল সবই
লজ্জা ভয়ে নীরা সেদিন, করল যে মনস্থির,
নিজেকে নিজে শেষ করল, হল স্মৃতি পৃথিবীর

কলেজে আজ স্মরণসভা, হারিয়ে গেছে আশা
কাঁদবে নীরা, তবুও চলবে খেলার ভালোবাসা,
এমনি করেই বারে বারে হারিয়ে যাবে নীরা?
সমাজ-বুকে আসবে কবে শুভচেতনার ধারা?

কন্যাশ্রী

হোসেনা খাতুন
ইংরাজী অনার্স, তৃতীয় সেমেস্টার

কন্যা মানে প্রতিজ্ঞা জেনো
কন্যা মানে যত্ন,
কন্যা হলো গোলাপ কুঁড়ি
প্রস্ফুটিত রত্ন।।

কন্যা মায়ের আলতো ছোঁয়া
লুকিয়ে থাকা হাসি,
কন্যা আবার যুদ্ধ জাহাজ
বিজয়িনীর বাঁশি।

কন্যা মানে বুকের বল
বাধাহীন ঘড়ি,
কন্যা মানে দিক বিজয়ের
মহাশূন্যে পাড়ি।

কন্যা মানে সরলতা
সান্ধ্য নদীর হাওয়া,
কন্যা মানে সাহস নিয়ে
সামনে এগিয়ে যাওয়া।

কন্যা মানে সূর্যের সাথে
বিবাদ করা কেউ
কন্যা মানে জগৎজননী
সাত সমুদ্রের ঢেউ।
কন্যা মানে তারায় তারায়
ছবি আঁকার বই,
কন্যা সকল জগৎ ভরায়
তাঁর তুলনা কই?

বিচ্ছেদ

অঙ্গনা ঘোষ
বাংলা বিভাগ, পঞ্চমসেমেস্টার

তাকে একা করার আগে একবার ভাবতে পারতে,
তুমি ছাড়া তার অবস্থাটা কি হতে পারে ?
মিঠে রোদ ছাড়া শীতের সকাল যেমন বেমানান
তুমি ছাড়া তারও ঠিক একই রকম অবস্থা।।
তুমি তাকে যত বেশি উপেক্ষা করেছিলে
সে তোমার জন্য তত বেশি অপেক্ষা করেছিল।
তুমি যত তার প্রতি অনীহা দেখিয়েছিলে
সে তত তোমার প্রতি আটকা পড়েছিল।
তুমি যত নিজেকে ব্যস্ত দেখিয়েছিলে
সে তত নিজেকে তোমার কাছে ভাসিয়ে দিয়েছিল।।
তুমি চাইলেই তাকে ভালবাসতে পারতে
কিন্তু তুমি তো কোনদিন চাওনি !
আজকে সে তোমাকে ভালোবেসে বড্ড একা।
তুমি এসেছিলেই হয়তো তাকে নতুন করে একা করার জন্য।
আজ তুমি দিব্যি নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছো
আর সে কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

অবেলা

ড. জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

নদীর স্রোতে মৃত্যু- ছায়া,
বুঝতে পারি আজ অবেলা,
সাগরতীরের ওই মোহনায়
হঠাৎ কখন থামলো খেলা !

শব্দগুলো ভীষণ একা
শেষ বিকেলের অস্তরাগে,
এক জীবনের ভেতর কবির
আর এক নতুন জীবন জাগে !

ঋতুর সাথে উত্তরণ আর
ঋতুর সাথে ছন্দপতন !
লেখার মাঝে ভাবনাগুলো
কুড়িয়ে চলে মানিক রতন !

কবির বুকে অরণ্য-সুর
রোদের দহন, পাতার আড়াল-
নক্সী কাঁথায় মনন-গাথা,
মৃত্যু-সাজে এই মহাকাল !

মন খারাপের উদাস হাওয়ায়
আকাশ ঝোঁকে মাটির দিকে,
ভৈরবীতে কবির বিদায়
বৃষ্টিস্নানের ইচ্ছে বুকে !

আজ বলবো, মায়ের কথা

নবনীতা মিত্র
বি.এ. পাস কোর্স, তৃতীয় সেমেস্টার

'মা', কেবল ডাক নয়, এক মায়াময় অনুভূতিতে ভরা ডাক। সন্তানের কাছে মা-ই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, এমন এক আশ্রয় যেখানে আছে কেবল শান্তি। মা, তুমি আমার প্রথম শিক্ষক, তুমি আমার বন্ধু - ডাক্তার সবটা কেবল তুমি। শীতের আদর তুমি, বর্ষার মাটির ভেজা গন্ধ তুমি, শীতের মিঠে রোদ তুমি, বর্ষার সদ্য জল পাওয়া গাছের দল তুমি, গ্রীষ্মের আমের মুকুল তুমি, গ্রীষ্মের শান্ত মিষ্টি প্রাণ জুড়ানো বাতাসও তুমি। জানো মা, যখনই এই ভীড়ে হারিয়ে যাই, তোমাকেই প্রথম খোঁজে আমার এই দুচোখ, মনে হয়,এক্ষুণি একটা কোমল হাত এসে আমাকে নিরাপদে বাড়ি নিয়ে যাবে। যখনই রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি, তুমি আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও আর বলো, ''কী হয়েছে? ভয় পেয়েছিস? বোকা, আমি আছি না, ভয় কীসের।'' যখন তাড়াহুড়ো থাকে, তুমি যত্ন করে খাইয়ে দাও, যখন ঘুম আসে না - মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। যখন নিজেকে দিকভ্রষ্ট ভবঘুরে মনে হয়, তোমার কোলে আশ্রয় পাই, আর কিছু মুহূর্তের মধ্যেই, সব ক্লেশ যেন কোথাও হারিয়ে যায়। পরীক্ষা আমার, একরাশ চিন্তা তোমার, শরীর খারাপ আমার, রাতজাগা জীবন তোমার। কতই না পরিশ্রম করো, সারাটা জীবন আমার জন্য। তাই বলছি আজ, শুধু মাতৃদিবসে বা অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়াতে নয়, মন থেকে তোমার প্রাপ্ত সম্মান তোমাকে দেবো সারাজীবন, তোমার মাথা নীচু হতে দেবো না কখনো। আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম নিও।

অচেনা বন্ধু

জিনিয়া সুলতানা
দর্শন বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

৫ দিন হলো সেমেষ্টারের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। একটানা বৃষ্টির কারণে বাড়ি থেকে বেড়োতেই পারিনি। আজ সকাল থেকে একটু সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে। তবে আবার কি, তিন বন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়লাম ছুটি কাটাতে। বরাবরই আমাদের রহস্য একটু বেশিই প্রিয়। তাই ঠিক করলাম কালসরণিতে যাব। ওহঃ আমার নামটাই তো বলা হয়নি, আমি হলাম বিষ্ণু আর আমার দুই বন্ধুর নাম রাম এবং অগ্নি। প্রবল বর্ষার কারণে রাস্তায়, মাঠে প্রচুর জল জমেছে। একটা শান্ত মনোরম পরিবেশ উপলব্ধি করতে করতে গ্রামের রাস্তা পার করে বড়ো রাস্তায় এসে পৌঁছালাম। মিনিট ১৫ অপেক্ষা করার পর বাস এলো, বাসে উঠে পড়লাম। বাস দ্রুত গতিতে যেতে শুরু করলো। বাসের কন্ডাক্টর এর কাছে টিকিট নিতে যাওয়ায় যখন আমি বললাম কালসরণির ৩টে টিকিট দিতে, এখন তিনি একটু হতভম্ব হয়েই আমার মুখের দিকে তাকালেন। আসলে কালসরণি জায়গাটা খুব একটা মানুষ-জন যাতায়াত করে না। শোনা যায় ওখানে নাকি ভূতের উপদ্রব রয়েছে। তবে সে সবে আমার বিশ্বাস নেই। কারণ এই যুগে দাঁড়িয়ে অলৌকিক শক্তির বিশ্বাস করাটা কেবলই হাস্যকৌতুক। কন্ডাক্টরের থেকে টিকিট তিনটি নেওয়ার পর আবার বাসের সিটে গিয়ে বসলাম। প্রায় ঘন্টা দুয়েক অপেক্ষার পর বাস এসে দাঁড়ালো কালসরণিতে। বাস থেকে নেমে জায়গাটা দেখা মাত্রই মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করতে শুরু করলো। চারিদিকে সবুজ, পাখির ডাক - জনমানব তেমন নেই বললেই চলে। তিন বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। রুম বুক করার পর রুমে গিয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। সন্ধ্যেবেলায় আবারও প্রচণ্ড বৃষ্টি নামলো। তাই আজ আর কোথাও বেড়োনো হোল না। একদিকে ভালোই হোল এতটা পথ অতিক্রম করার পর শরীরটা বেশ ক্লান্ত ছিল। তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া শেষ করে ভালোভাবে বিশ্রাম নিয়ে নিলে কাল থেকে ভালো করে এই রহস্যময় কালসরণি ঘুরে দেখা যাবে। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে পূর্ব দিকের জানালাটা খোলায় বুঝলাম বৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত আগেই থেমেছে। গাছ থেকে বৃষ্টির জল এখনো পড়ছে। আমার সাথে সাথে অগ্নিও ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলো। রামকে প্রায় মিনিট ১৫ ডাকার পর উঠলো। সকালের খাওয়া শেষ করে বেড়িয়ে পড়লাম আমি, রাম এবং অগ্নি। যেতে যেতে একটা ঘন জঙ্গল দেখতে পেলাম। দেখামাত্রই বুঝলাম এটাই সেই কালসরণির রহস্যময় জঙ্গল। তবে আর দেরি কিসের রহস্য যেখানে, তিন বন্ধু সেখানে। ঢুকে পরলাম জঙ্গলের ভিতরে। বেশ ঘন জঙ্গল। সূর্যের আলো গাছের পাতা অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে না বললেই চলে। নানান পাখির আওয়াজ, বেশ একটা গা-ছমছমে পরিবেশ। হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের অনেকটা গভীরে প্রবেশ করে ফেলেছি সেটা বেশ বুঝতে পারছি,

চারিদিকের পরিবেশ দেখেই। বরাবরের মতোই অগ্নি ক্যামেরা নিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির ছবি তুলতে লাগলো। হঠাৎ দেখি রাম গুন গুন করে গান করতে শুরু করেছে। বুঝলাম জঙ্গলের গা-ছমছমে পরিবেশ তাকে বেশ কাবু করে ফেলেছ। অর্থাৎ সে ভয় পাচ্ছে, আমি বললাম ''কি ভাই, রাম ভয় পাচ্ছ নাকি?'' রাম কাঁপা কণ্ঠে বললো ''ভয়! কই না তো,''। পিছন ফিরে অগ্নিকে যেই ডাকতে যাব দেখি সে নেই। এই ঘন জঙ্গলে একা একা সে গেল কোথায়? অগ্নি, অগ্নি বলে বেশ কয়েকবার ডাক দিলাম, কোনো সাড়া পেলাম না। অন্যদিকে ঘুরে দেখি প্রবল বেগে আমার দিকে দৌঁড়ে আসছে রাম। তার চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। জঙ্গলের উত্তরদিক থেকে ভেসে আসছে চাপা আর্তনাদ। সেইদিকে ছুটতে লাগলাম রাম এবং আমি। গাছের ডালে, গুঁড়িতে ধাক্কা লেগে, হাত, পা কেটে গেছে কিন্তু সেই সবের কথা না ভেবে দৌড়তে লাগলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, হঠাৎ দেখলাম আমরা যেখানেই ছিলাম সেখানেই আছি, বিন্দুমাত্র এগোতে পারিনি। রাম অগ্নির নাম করে কাঁদছে। আমি অগ্নিকে চিৎকার করে ডাকছি। কিন্তু অগ্নির কোন সাড়া নেই। আর ওই চাপা আর্তনাদ আরো গাঢ় হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, ওই আর্তনাদ আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। পাখির ডাক কমে যাচ্ছে একটা নিস্তব্ধ ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। বুঝলাম এখান থেকে তাড়াতাড়ি না বেড়োতে পারলে অগ্নির মতো হয়তো আমরাও জঙ্গলের ফাঁদে ফেসে যাবো। হঠাৎই পিছন থেকে কে একটা মহিলা কণ্ঠে বলে উঠলো -''কেন এসেছো এখানে?, চলে যাও, চলে যাও'' আমি কম্পিত কণ্ঠে বললাম ''কে? কে ওখানে?'' কোনো উত্তর না পাওয়ায় আবারও বলে উঠলাম ''আমার বন্ধু অগ্নি কোথায়? ওকে ফিরিয়ে দাও তবে আমরা চলে যাব''। তখনই একটা বাজে বিচ্ছিরি শব্দ করে হাসির আওয়াজ শোনা গেল আর তার সঙ্গে অন্য একজন বলে উঠলো ''সে আর ফিরবে না'' বলেই আবার উচ্চ কণ্ঠে হাসতে শুরু করলো। আমি আবারও সাহস করে 'অগ্নি', 'অগ্নি' বলে চিৎকার করলাম। কিন্তু তখনই দেখলাম রাম জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কোনো রকমে রামকে কোলে তুলে সেখান থেকে প্রবল বেগে ছুটতে শুরু করলাম। আসে পাশের ঘন অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে আমার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো কিন্তু সে সবের পরোয়া না করে আমি দৌঁড়তে লাগলাম। কোনো রকমে জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তায় এসে উঠেছি। তারপর পাশের জলাশয় থেকে জল নিয়ে রামের মুখে, চোখে দিয়ে ওর জ্ঞান ফেরালাম। জ্ঞান ফেরা মাত্র সে বললো ''অগ্নি কই?'' আমি মৃদু কণ্ঠ হয়ে মাথা নীচু করে বললাম ''জানি না''। রাম কাঁদতে শুরু করলো। কোনো রকমে নিজেদের সামলে হোটেলে এলাম। এসে দেখি অগ্নি হোটেলের সামনের ফুল বাগানটার ছবি তুলছে। কি আশ্চর্য! আমি বললাম ''অগ্নি তুই''। অগ্নি বললো - ''হ্যাঁ আমি, কিন্তু তোরা কোথায় ছিলিস, সকাল থেকে খুঁজছি তোদের। ফোনের নেটওয়ার্ক ও ছিলো না তোদের।'' তারপর আমি আর রাম একে আপরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। রাম-এর মুখ বিস্ময়ে হতভম্ব। তবে আমাদের সাথে এতক্ষণ যে ছিলো সে কে?

নকলনবিশ পশুপাখি

অনুষা ঘোষ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রাণিজগতে খাদ্য ও খাদকের সম্পর্কটি চলে আসছে। প্রাণিজগতের প্রতিটি স্তরেই এই সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু এই বিষয়টা এতটা সহজ নয়। কারণ খাদ্য কখনই নিজে খাদকের কাছে ধরা দেয় না। উল্টে নিজেদের বাঁচানোর জন্য বেছে নেয় অনেক উপায়। অন্যদিকে খাদকও ছাড়ার পাত্র নয়। তাই এই দুই শ্রেণির প্রাণিই বেছে নেয় বিভিন্ন উপায়। এই উপায়গুলির মধ্যে একটি হল প্রাণিদের নকলনবিশ স্বভাব বা মিমিক্রি। এর মানে প্রাণিরা বিপদ বুঝলেই তার চেহারা, আকৃতি, রং, গলার স্বর এবং স্বভাবকে পরিবর্তন করে প্রকৃতির মতো বা অন্য কোনো প্রাণির মতো হয়ে যায় যাতে খাদকরা তাদের চিনতে না পারে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ সরীসৃপ, পাখি ইত্যাদি সকলেই শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য অথবা শিকার ধরার জন্য বিভিন্ন ভাবে এই স্বভাবটির সাহায্য নেয়।

এইবার আমরা দেখি মিমিক্রির সাহায্যে কিভাবে এক জাতীয় প্রাণি অন্য প্রাণিদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। যেমন মোনার্ক প্রজাপতিরা তাদের শরীরের গাঢ় কমলা রঙের জন্য বিষাক্ত হয়, তাই বিভিন্ন ধরনের পাখি, ব্যাঙ বা সাপ তাদের খায় না। অন্যদিকে ভাইসরয় প্রজাপতিরা একদমই বিষাক্ত হয় না। তাই তারা বিপদ বুঝলে মোনার্ক প্রজাপতির মতো কমলা রং নকল করে নিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাডাগাসকারের যে সব ব্যাঙের গায়ে বিষাক্ত গুটি থাকে, তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য এই গুটি থেকে বিষ নির্গত করে। ফলে ওই একই রকম দেখতে অন্য প্রজাতির ব্যাঙেরাও বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

এবার অন্যরকম কিছু নকলনবিশ প্রক্রিয়ার ঝলক দেখে নিই। হক মথ ক্যাটারপিলার নামে এই পতঙ্গটি বিপদ বুঝে তাদের দেহের গমনের অংশের পা এবং তাদের মাথা এমন ভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, দেখতে অনেকটা সাপের মতো মনে হয়। ফলে এদের শত্রুরা সহজেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

ওয়েষ্টার্ন হগনোস প্রজাতির সাপেরা বিপদ বুঝলে মৃত সাপের মতো করে শুয়ে থাকে এবং নিজেদের শরীর থেকে একরকমের গন্ধ বের করে যাতে শত্রুরা তাদের মৃত ভেবে ছেড়ে দেয়।

খাবারের সন্ধানে শিকার ধরার জন্যও প্রাণিরা বিভিন্নভাবে মিমিক্রি করে থাকে। যেমন, টাইগার পিস্টল শ্রিম্প খাবারের সন্ধানে জলের মধ্যে এমন আওয়াজ করে যে, মনে হয় জলের প্রচণ্ড স্রোত আসছে। ফলে অন্য মাছেরা ভয় পেয়ে যায় এবং শ্রিম্প সহজেই খাদ্য শিকার করে।

মিমিক অক্টোপাস নামে, সামুদ্রিক এই প্রাণিটি তাদের লম্বা শুঁড়ের সাহায্যে প্রায়ই অক্টোপাস, সি স্নেক, জেলি ফিস ইত্যাদি প্রাণির আকার ধারণ করে এবং তাদের লম্বা শুঁড়ের সাহায্যে অন্য প্রাণিদের শিকার করতে সমর্থ হয়।

‘ফর্ক টেলড ড্রাংগো’ নামের এই জাতীয় পাখিরা খিদে পেলে মিয়ার ক্যাটের গলার স্বর নকল করে ডাকতে থাকে ফলে মিয়ার ক্যাটরা তাদের জায়গা ছেড়ে চলে যায় আর পাখিরা অনায়াসে তাদের খাবার খেয়ে নেয়। আবার পালানোর সময় পাখিগুলো, মিয়ার ক্যাটরা যাদের ভয় পায় তাদের গলার স্বর নকল করে ডাকতে থাকে এবং সহজেই খাবার চুরি করে পালিয়ে যায়।

লাইরি জাতীয় পাখিদের বিশেষত অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। এই পাখিরা কিন্তু তাদের নকলনবিশ স্বভাবের জন্য বেশ জনপ্রিয়। এরা প্রায় ২০টি বিভিন্নধরনের পাখির গলার স্বর নকল করতে পারে। এবং প্রয়োজনে বিপদ থেকে বাঁচতে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রং পরিবর্তনও করতে পারে।

বৈচিত্র্যে ভরা এই প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রাণির নকলনবিশ স্বভাবের কিছু মজার গল্প আমি তোমাদের জানালাম। এছাড়াও আরও বহু পশুপাখি রয়েছে, যাদের আরও নানারকম অদ্ভুত স্বভাব রয়েছে। বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই এই পৃথিবীতে।

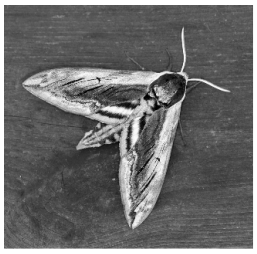

হক মথ ক্যাটার পিলার

লাইরি পাখি

মিমিক অক্টোপাস

ওয়েস্টার্ন হগনোস সাপ

মোনার্ক প্রজাপতি

ফর্ক টেলড ড্রনগো

শেষ মুহূর্ত

নন্দনী গুপ্তা
বিজ্ঞান বিভাগ, জীববিদ্যা (পাস), পঞ্চম সেমেস্টার

গ্রীষ্মের ছুটি কখন শেষ হয়ে গেছে, বেশ অনেক দিন ধরে স্কুলও চলছে। প্রতিটা বিষয়ের ক্লাসই এখন এমন পর পর চলতে থাকে, কারণ সামনে পূজোর ছুটি আর স্কুল খুললেই পূজোর ছুটির পর কিছু দিনের মধ্যে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা। আবহাওয়াতেও শরৎকালের ভাব রয়েছে। এমনি একদিন ক্লাসে বসে সবাই বেশ আনন্দেই ছিলাম কারণ এখন ভূগোল বিষয়ের ক্লাস, তারপরই টিফিনের ঘন্টা আমরা সবাই মিলে একটু মাঠে নামব, একটু খেলার সময় পাব। কিন্তু একি দিদিমণি আসতে না আসতেই ক্লাসের কয়েকজন বলে উঠল, 'ম্যাম্ আজকে কুইজ এর প্রশ্ন করুন না'। তখনই ম্যাম্ বললেন 'ঠিক আছে তাহলে আজকে ভূগোলের কুইজ কম্পিটিশন হোক, দেখা যাক তোমরা কত পড়াশোনা করো'। সবার মুডটা আনন্দের ছিল কিন্তু ভূগোলের ক্যুইজ শুনে একটু যেন কেমন হল, কিন্তু ম্যাম্ বললেন, ঠিকআছে শুধুমাত্র তোমাদের নবম শ্রেণীর ভূগোল বই থেকেই ক্যুইজটি করা হবে। দুটো দল হবে A এবং B, বামদিকের সবাই A দলের এবং ডানদিকের সবাই B দলের। এবার আমরা একটু আনন্দিতই হলাম, এই দলের কথা শুনে। কারণ এখানে পয়েন্ট পাওয়ার একটা ব্যাপার ছিলই। এবার ক্যুইজ কম্পিটিশন শুরু হল এবং 'A' দল থেকে কুইজের এর প্রশ্ন করা শুরু হল। 'A' দল ঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের ১০ পয়েন্ট দেওয়া হল। এবার 'B' দলকে প্রশ্ন করা হয় এবং তারাও ঠিক উত্তর দিয়ে ১০ পয়েন্ট পেল। এইভাবে চলছে 'A' দলের ৬৫ পয়েন্ট হয়েছে কিন্তু 'B' দলের ৪০ সে আটকে রইল কারণ ইতোমধ্যেই ২ টো শূন্য পড়েছে এবং 'A' দল একটা 'B' দলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একটা ৫ পয়েন্ট বোনাস পেয়ে ৬৫ পয়েন্ট করেছে। এবার 'B' দলের সবাই চিন্তায় কী হবে কী হবে? তারা ভেবে পাচ্ছে না, আবার 'A' দলকে প্রশ্ন করা হল এবং এবার তাদের পর পর দুটো শূন্য বসল এবং 'B' দলও একটি 'A' দলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ৫ পয়েন্ট বোনাস পেল এবং এখন তাদের ৪৫ পয়েন্ট হয়েছে এবং এরপর দুটো আরও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে 'B' দলও এখন ৬৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। এবার দুই দলই সমান, এখন আবার 'A' দলকে প্রশ্ন করা হল এবং 'A' দল ঠিক উত্তর দিয়ে ৭৫ পয়েন্ট করে ফেলেছে। ম্যাম এবার আমাদের দলকে বললেন 'এটাই তোমাদের শেষ প্রশ্ন', আমরা সবাই এবার বেশ চিন্তায় যে এটা আমাদের শেষ প্রশ্ন যদি বলতে না পারি, যদি হেরে যাই তাহলে? এখন আমরা কয়েক সেকেণ্ড নিঃস্তব্ধ হয়ে গেছি যাতে প্রশ্ন ভালো করে শুনতে পারি, ম্যাম প্রশ্ন করলেন আর সবাই পারব না পারব না বলে হইচই শুরু করল 'A' দলের দিক থেকে আওয়াজ আসছে পারব না, ওরাও পারবে না, আমরাই জিতবো, এইসব হইচইতে আমার হঠাৎ করে উত্তরটা মনে পড়ল এবং এত হইচইতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তরটা বলে ফেললাম, আবার একবার পুরো ক্লাস নিঃস্তব্ধ হয়ে উঠল, ম্যাম কিছুক্ষণ থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন বসিয়ে দাও ১০ এবং মুহূর্তের মধ্যে হইচই শুরু হলো, আমার দলের অনেকেই আমায় জড়িয়ে ধরল। সেইদিন যেন ওই মুহূর্তে নিজেকে যুদ্ধ জয়ী সেনানায়কের মতো মনে হয়েছিল, এটা ছিল কিছুক্ষণের অনুভব কারণ বোর্ডে চোখ যেতেই দেখা গেল, কম্পিটিশনে কেউ জয়ী হয়নি দুই দলই সমান পয়েন্ট ৭৫ পেয়েছে।

আমার স্বপ্নপূরণ

শ্রীদিশা ভট্টাচার্য্য
পঞ্চম সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

রবি ঠাকুরের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঠিক কবে হয়েছিল মনে নেই, তবে নিশ্চিত ভাবেই জানি মায়ের গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীতের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, স্কুলে ভর্তিরও অনেকটা আগে । তারপর স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর সহজপাঠের হাত ধরে আমার পুনরায় কবিগুরুর সাথে পরিচয় হল। অন্ধ কানাই যেথায় গান শুনিয়ে বেড়ায়, বুড়ো বটগাছ দুই হাত ধরে ছায়া দান করে , বেঙ্গমা বেঙ্গমির গান, ছোট্ট মেয়ের মেলা বেগুনি রঙের শাড়ি এই সব কিছুই এক অদ্ভুত মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছিল আমার হৃদয়ে এবং আমার মেয়েবেলাটা সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠেছিল তারই লেখা পড়ে।

তাই, ধীরে ধীরে যখন বড় হলাম, বিশ্বকবির হৃদয়ের প্রশান্তি দিয়ে ঘেরা শান্তিনিকেতন যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হল। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ইচ্ছা না বলে স্বপ্ন বলাই ভালো, তা পূরণ হয়েছিল ২০২২ সালের ৩রা ডিসেম্বর। আমার ভালোবাসা এবং গর্বের কলেজ হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগ থেকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হবে স্থির হল। প্রসঙ্গত বলি, আমি সেই সময় বাংলা স্নাতক বিষয়ে দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী ছিলাম।

৩ রা ডিসেম্বর ২০২২ এ সকাল ৭-৩০ টায় বাস ছাড়বে কলেজের ঠিক সামনে থেকে; এই অনুযায়ী সকাল সাতটার মধ্যে কলেজ প্রাঙ্গণে সকলকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যথাসময়ে বাস গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

এই ভাবেই আমরা শান্তিনিকেতনের মায়াময় পরিবেশে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে বহু মূল্যবান স্মৃতিরত্ন মনের মনিকোঠায় বন্দী করে নিয়ে এসেছি।

শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা, বিশ্বভারতী মিউজিয়াম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি বাড়ি কোনার্ক, শ্যামলী, প্রতীচী, উদীচী আর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি উদয়ন। প্রতিটি স্থানে যেন প্রকাশিত হয়েছে এক অপরূপ মননশীলতা। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য - 'তিন পাহাড়ি বটগাছ', যা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোপাই নদী থেকে এনে বপন করেছিলেন। এই ছোট বটের চারাটি আজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সেই স্বর্ণযুগের প্রতীক রূপে দন্ডায়মান বিশাল বটগাছটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সে তার সকল শাখাপ্রশাখা দিয়ে ভালোবেসে, স্নেহভরে আগলে রেখেছে কবিগুরুর সাধের শান্তিনিকেতনকে।

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম 'উপাসনা গৃহ' দেখে। সেখানকার এক স্থানীয় মানুষ, যিনি আমাদের টোটো চালক ছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন যে,-'' উপাসনা গৃহটি বেলজিয়ামের কাজ এবং

ইটালিয়ান টালি দ্বারা নির্মিত হয়েছে", তার অপরূপ শোভা চিরকাল মনে থাকবে এবং আরো জেনেছিলাম, উপাসনা গৃহে কোন মূর্তিপূজা হয় না, ব্রাহ্ম নিয়মে ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে স্মরণ করা হয়। আজও প্রতি সপ্তাহে বুধবার সকালে এক ঘন্টার জন্য উপাসনা গৃহ খোলা হয়।

সোনাঝুরি হাটে ক্রেতা বিক্রেতার ব্যস্ততা, ভিড় যেন 'সহজ পাঠে' পড়া সেই আশ্বিনের হাটের জীবন্ত ছবি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এর বিশেষ চিন্তাধারায় নির্মিত 'শান্তিনিকেতন গৃহ'টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গৃহটির কাঠামো অপূর্ব। তার মাধ্যমে তিনটি ধর্মের সমন্বয় এবং শান্তির বাণী প্রকাশিত হয়েছে। বাড়িটি তিন দিক থেকে দেখলে বাড়িটি তিন রকম দেখায়। যেমন - একদিক থেকে মন্দিরের ন্যায়, অন্য আরেক দিক থেকে মসজিদের ন্যায়, আবার অন্য আরেক দিক থেকে গির্জার ন্যায় দেখায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং মানবতার জয়গান গাওয়ার বার্তা সুনিপুণভাবে পাওয়া যায় এর থেকে। তাঁর পিতার সেই ভাবনাকেই নিজের লেখনীর মাধ্যমে আরো বিকশিত করে বিশ্বের সকল প্রান্তে -প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্ব কবি।

শান্তিনিকেতন নিয়ে যতই লিখি লেখা যেন ফুরোতেই চায় না। শান্তিনিকেতনের প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে এক অভিনব উপলব্ধি, এক অপরূপ বিস্ময়, এক অসামান্য মুগ্ধতা। শান্তিনিকেতন তার চির নবীন চিন্তনে, মননে, সৃজনশীলতায় অক্ষয় স্থান করেছে আমার হৃদয়ে।

সব শেষে, এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্য এবং আমার একান্ত স্বপ্ন পূরণের জন্য 'হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়' এবং 'বাংলা বিভাগ'-এর সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হালদার পরিবারের মা দুর্গার পূজার ইতিহাস

উৎসা সাধু
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া শহরের ষন্ডেশ্বর জীউ-র মন্দির একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান, এই মন্দির এবং হালদার বাড়ি থেকে সংগৃহীত কিছু নথিপত্র থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চুঁচুড়া এলাকার ষন্ডেশ্বর তলা এলাকায় অবস্থিত হালদার বাড়ির সদস্য শ্রী দিগম্বর হালদার প্রাথমিক ভাবে ষন্ডেশ্বর তলা এলাকায় ষন্ডেশ্বর শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়া এলাকার পৌর সভার সভাপতি মুরারী মোহন মুখোপাধ্যায় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুনরায় এই মন্দিরটিকে নতুন করে সংস্কার করে ষন্ডেশ্বর জিউ-এর নামে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ষন্ডেশ্বর তলা এলাকায় অবস্থিত হালদার বাড়ির দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। এই হালদার বাড়ির মধ্যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন তিনি নিজের সাধ্য মতো তার কাছে আগত সমস্ত ভিক্ষার্থীকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। একদিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির রাতে একজন বৃদ্ধা বৃহন্নলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ এর কাছে শুধুমাত্র সেই রাতে তার বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ করলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃদ্ধা মহিলাকে সেই রাত্রে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরেরদিন সকালে ব্রাহ্মণ তাকে বাড়িতে কোথাও খুঁজে পাননি বরং তার বাড়ি থেকে একঘড়া সোনার মোহর ও মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি হালদার বাড়িতে প্রথম মা দুর্গার পূজা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মণ মারা যাবার অনেক বছর পর হালদার পরিবারের অষ্টাদশতম উত্তরসূরীর অন্যতম সদস্য শ্রী দিগম্বর হালদারের পৌত্র শ্রী নবীনচন্দ্র হালদার ও তার স্ত্রী কুসুমকুমারী দেবী হালদার বাড়িতে পুনরায় বাসুদেব শ্রীধর ও মা দুর্গার পূজা শুরু করেছিলেন।

প্রতিপদ অর্থাৎ রথের দিন পিতল নির্মিত রথে তাদের কুলদেবতা শ্রীধরের পুজো হয় এবং মা চন্ডীর ঘট স্থাপন করা হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী এইদিন বাসুদেব শ্রীধর মা দুর্গার কাঠামোতে প্রথম মাটি লাগান। বর্তমানে ষন্ডেশ্বর তলা এলাকার বাসিন্দা মৃৎশিল্পী শ্রী বাবু পাল মা দুর্গার কাঠামো নির্মাণ করেন।

প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত হালদার পরিবারের প্রতি সদস্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণব মতে মা দুর্গার আরাধনা করেন। এই সময়ে তারা তাদের কুলদেবতা বাসুদেব শ্রীধর ও মা দুর্গাকে বিশেষ ধরণের নিরামিষ ভোগ প্রদান করেন যেমন ভাত, শুক্তো, (নেংচা পাতা, কচু পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি) আলুর দম, লুচি, পায়েস, তেতুলের টক (মার প্রিয়) এই গুলিই নিমন্ত্রিত ও বাড়ির সদস্যরা আহার করেন।

ষষ্ঠীর দিন এই পরিবারের ছেলেরা মায়ের বোধনের পুজো করেন। সপ্তমীর দিন ষন্ডেশ্বর তলা ঘাটে ছেলেরা নবপত্রিকা স্নান করানোর পরে পুজোর মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অষ্টমীর দিনকে মায়ের শক্তিপুজো হিসাবে মনে করা হয়। সকালে ১০৮টি পদ্ম ফুল দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি ও ১০৮ টি প্রদীপ দিয়ে সন্ধ্যারতি হয়। যে সমস্ত মহিলারা মায়ের কাছে মানত করেন তারা তাদের মাথায় সড়া (মাটির) বসিয়ে ধুনো পোড়ায়।

নবমীর দিন বাড়ির ও পাড়ার দু বছরের নিচে ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা সন্তানদের নিয়ে কুমারী পুজো হয়। বৈষ্ণবমতে পুজো হওয়ার কারণে এখানে ছাগ বলির পরিবর্তে কুমড়ো বলি দিয়ে মায়ের পুজো হয়। এরা এদিন পূজোর শেষ দিন হিসাবে সন্ধ্যারতির শেষে যজ্ঞকুন্ডে জল ঢেলে বাসুদেব শ্রীধর ও মা চন্ডী কে শুধুমাত্র হোমের টিকা পড়ানো হতো। তারা মনে করে কিছুদিন আনন্দের জন্য তারা মা ও তার সন্তানদের তার শিবের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে তাই সুস্থভাবে মাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা যৎ -সামান্য কিছু টাকা মায়ের হাতে দেয় এবং এটা তাদের কর্তব্য বলে মনে করেন।

বিজয়া দশমীর দিনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল ‘‘অপরাজিতার বালা ধারণ’’। এইদিনে এ বাড়ির ছেলেরা অপরাজিতা গাছের ডালগুলোকে নিজেদের হাতের কব্জির সাইজে গোল করে কেটে তার মধ্যে মার্কিন পেপার র‍্যাপার করে অপরাজিতার বালা ধারণ করে। ষণ্ডেশ্বর তলা মন্দিরের দেব-দেবীর কাছ থেকে তার আশীর্বাদ নিয়ে আসার পরে বাড়ির মহিলারা মাকে বরণ করেন ও দর্পণে মুখ দেখে মায়ের দক্ষিণান্ত হয়।

প্রাচীনকালে এই পরিবারের সদস্যরা তাদের নিজস্ব পাঠক ঘাটে দুটি নৌকার মাধ্যমে মায়ের গঙ্গা ভ্রমণের পরে, মাকে গঙ্গায় বিসর্জন করে দিতেন সমগ্র চুঁচুড়াবাসী এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য চুঁচুড়ায় পাঠক ঘাটে সামিল হতেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত দুর্ভাগ্যের ফলে এই পরিবারের সদস্যরা তাদের নিজস্ব পাঠক ঘাটে সাধারণভাবে মায়ের বিসর্জন করে।

এই পরিবারের সদস্যরা পুজোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় রুপোর বাসন ব্যবহার করে।

বর্তমানে হালদার পরিবারের নবপ্রজন্মে তন্ত্রসাধক হিসেবে সেই নরেশ হালদার ও পুরোহিত হিসাবে শ্রী দেবজ্যোতি হালদার, পরিবারের পূজার্চনার দায়িত্বে আছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

তথ্যসূত্র - হালদার পরিবারের সদস্য শ্রী দেবজ্যোতি হালদার পরিবারের মা দুর্গার পুজো (প্রায় ৪৫০-৫০০ বছরের) সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে এই প্রবন্ধ রচনা করার ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করায় আমি ওনার কাছে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞ।

SCREAMING

Pratishruti Bhattacharya
English Honours, 6th Sem.

It's all about a dream.

I was coming from my academy and gave a see-off to my students. I had a destination marriage party at Naihati. My mother was waiting for me to come. Like everyday I go into a narrow street which was connected to the main road. There was a group of boys and girls whose eyes seemed hellish. I came across them and suddenly one of them called me from behind. I looked back and saw a girl who was indicating a boy standing on the opposite side of the road and told me *didi* that boy is calling you and wanted to tell you something. I just ignored and told her I will talk to you tomorrow my mother is waiting for me, so I have to go. But he forcefully held up my hand and took me in front of him. I was totally in an awful moment and could not say even a word. Suddenly the boy propose to me but in spite of being angry I could not tell him anything. Ignore him and started walking towards my house after sometime I saw they were following me and I understood their intention and ran as fast as I could. In front of my house my mother was waiting for me and I tried out to get help from her, me and my mother scolded me and was gone. I was totally messed up and could not make up my mind. I saw a woman coming beside my house. I requested her to help me so she left me in my house. I saw those boys were still chasing me. I closed all the doors of my house and ran into my room. I heard some awkward noise of breaking the lock of my house. After few minutes I slightly opened the door and saw they were outside of my house. After sometime they kicked at my. rooms door. I was flunch in the floor the boy came into my room and try to hit my mother. In my mother's throat I saw some amount of blood coming out. Suddenly I saw myself as of naked and full of blood in my arms and chest. I did not know how it happened! Decide me there was a plagiam who was hanging on the wall I took it up and give a slash at his throat. Everything was scattered with blood. I took up my mom and wanted to get out of my room but I was confused if he died or was alive? I went up to him but it was my fault he is stood up and stabbed me. With a father of fear I hope up and saw my mother beside me and realise it was all about a dream. But I have came to realise that women is another from of goddess Durga when I was not able to reach that boy despite all my efforts mother to the knife and after that she said me even go she was injured from their hands. No one is stronger than mother which I realise in my dream. My parents were calling me for a long time, but I was last in another cycle and not in a position to hear anyone but I after so many calls and found myself sweating and high fever as well.

Women, Rights and Empowerment

Kabita Dey
Professor, Department of English

History of India depicts great women like Razia Sultan the first female ruler of Delhi Sultanate, Ahilyabhai Holkar, Jijamata the strong influence in the life of Shivaji, Rani Laxmibhai, who refused to bow before the might of the Britishers. Sarojini Naidu the first Indian Women to be president of the Indian National Congress, Savitribai Phule a poet who fought for the rights of women, Aruna Asof Ali an Indian educator and political activist, Kiran Bedi the first women IPS officer, Saina Nehwal the first Indian women to win a medal in Badminton at 2012 Olympic Games. The country is proud of its Prime Minister late Mrs. Indira Gandhi, women President Mrs Pratibha Patil and Droupadi Murmu the current president of India. Apart from all these distinguished personalities there are other various prestigious positions held by women in the corporate sector, the defense, foreign affairs, sports and in innumerable many other fields.

But unfortunately when on one hand we take pride in the contribution of these great women yet, on the other hand women in our country faces a lot of discrimination, women in Indian society have been victims of humiliation, torture and exploitation, Ideologies, Institutional practices and existing norms in the society have triggered their harassment. In spite of legislative measures in favour of women, their education and their gradual economic independence countless women across the country are humiliated, beaten, raped, mutilated, and killed with impunity. The conditions of rural women are worse than their urban counterparts. Most of the women are mute witness to the happenings around them. In recent times atrocities against the women has increased. Flip through the pages of newspaper, not a single day goes by without a report on crime against women. What the authority are doing is a big question for self introspection for law and order ministry. The cities once considered safe for the women are not at all so today if not worse. The condition of women in India is due to the patriarchal nature of society. Most women are not aware of their rights. Women are not recognized as human with her own independent mindset. Even an educated women faces a lot of harassment in her own home as well as in workplace.

The UN Declaration on Human Rights mention the word Human which simply means men as well as women and when we speak of human rights, it simply means the right to live a dignified life, enjoying various rights and privileges. This do not seem to apply when it comes to women. They are deprived of their lawful rights and privileges. Even though women have scaled great heights of success and occupied position that was predominately the domain, the condition of vast majority whether they in plane area or rural, educated or uneducated is abyssal. The solution lies in women empowerment. Women empowerment plays a significant role in telling them know their rights. Women's empowerment is a related term that focuses on attention to women's degree of control over their own lives and environments and over the lives of those in their care, such as their children.

Empowering women and improving their status are essential to realizing the full potential of economics, political and social development. Women acquire the same status, opportunities and social, economic and legal rights as men, as they acquire the rights to reproductive health and the right to protection against gender based violence, human confidence necessary to participate fully in development process.

Again, economic empowerment is central to women's advancement as it is to the advancement of all people. Poverty is the great challenge for all : men, women and children. Even a small amount of self generated money can empower. Financial solvency gives freedom of choice-and choice is power.

There are certain trails that must be forwarded, They only need a level playing field and a catalyst to get them started. An empowered women demonstrates some of the following characteristics.

- An empowered woman appreciates the value of her contribution whether remunerated or not.
- She appreciates the time she spends on domestic work and outside the home.
- She is aware of her potentials to contribute to the progress of the family, community and society at large.
- She seeks to get scientific insights into superstitions and challenges those which are unjust to women.
- She has freedom of movement and expression on par with men.
- The empowered women is aware of her rights as a citizen and protects them actively. She is convinced of her equality with men.
- She knows which law is unfair towards women, seeks to use her legal knowledge to protect her and other women's rights.

The empowered woman nurtures herself. She wants everybody to understand that, as a human being, she is entitled to happiness in the same way that others are.

There are many government and non-government organizations right from the grassroots level i.e. village to the national level as well as International organizations that are working for women empowerment and fighting for women's rights. Along with women empowerment, the man need to be trained to change their observation regarding women - respect women and honour her dignity and consider her an important pat of his own well being HIS existence is impossible without HER.

Let there be an echo of Alice Paul's words :

There will never be new world order until women are a part of it.

&

Malala Yousafzai's Observation :

We can not succeed when half of us are held back.

Persuasion & Popular Media

Satavisha Nandy
English Hons., Sem – Ill

Our everyday choices seldom exist in vacuum, for the popular culture we consistently shape how messages are received by us. The perspectives of individuals depend on the myriad of things they watch or read. While talking about popular media, one cannot ignore the booming industry of Bengali television serials. These daily segments, usually having a 30-minute runtime, feature the archetype of the "docile" and "humble" housewife. This woman eventually gets several allegations levelled at her from her in-laws, ranging from being a cheater to being devoid of character and honor-less. This woman is obviously not a working woman — for that is just not what the good and "traditional" woman is supposed to be. And when the time comes, the husband never supports his wife, for choosing the wife in the mother-wife dichotomy is a heinous crime. The woman overcomes her trials all by herself and is accepted back in the family. Alas, the show has to go on and therefore, this exact same cycle continues. All's well that ends well, right?

In the 21st century, where the feminist zeitgeist is defined by the youth moving towards progressive views and breaking free from "traditions" that systematically subjugate women and minorities, it seems dystopian that something that functions on such a violently misogynistic scale can be televised statewide. It doesn't stop there, however. A good number of Bollywood movies takes this same misogynistic structure and glamorizes it tenfold. Animal (2023) - one of the biggest films of the year - is the most recent example. The main character in these films dehumanizes women constantly and makes a mockery of their abuse by romanticizing it. In mainstream Bollywood, not only is our pain ridiculed, it is sold to the masses in exchange of cash. Our suffering is sold as normalcy. It all seems very much like a sanctioned psyop that valorizes the meekness and subserviency of women and gets money by distributing it.

Violence against women in India is an everyday occurrence. To provide a platform to films and television where such chauvinistic and violent ideals are held up and idealized is the indirect perpetuation of gendered objectification as well as systematic subjugation. Hasn't it been said since forever that Art is a direct reflection of society at a particular time? The youth of India deserve art that is free of bigotry and prejudice. To even think about the supposed "entertainment" it provides is inhuman when it sets up an entire generation of women to live through, and eventually perpetuate this cruel patriarchal cycle.

মধুসূদনের জীবন ও সৃষ্টি ঃ জন্ম দ্বিশতবর্ষের আলোকে

ড. নির্মাল্য সেনশর্মা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

'মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত' কবি মধুসূদনের জন্মের দ্বিশতবর্ষ আমরা পেরিয়ে এলাম। মধুসূদন, যিনি উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সার্থক প্রতিনিধি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ সমন্বয় সাধক, যিনি বহুভাষাবিদ, তাঁরই সৃষ্টিতে উদঘাটিত হয়েছে মানব মনের অতলস্পর্শী গভীরতা আর সীমাহীন বিস্ময়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব নাট্যকার রূপে, তারপর কাব্যসাধনায় তার আত্মনিয়োগ। নাটক ও কাব্য দুটি দিকেই তিনি এনেছেন আধুনিক ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা। স্বল্পায়ু তার জীবন, সাহিত্য-সাধনার কালসীমাও সংক্ষিপ্ত– মাত্র কয়েক বছরের ।

যে মধুসূদন নতুন যুগের আদর্শ বাণীবাহক – তাঁর হাতেই ঘটে গেছে আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সার্থক উদ্বোধন। তিনি কবি – মহাকবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক রূপকার, আধুনিক যুগের নাটকের সার্থক রচয়িতা, তার হাত বেরিয়ে এসেছে সার্থক ট্রাজেডি কিংবা যথার্থ প্রহসন, তিনি পত্রকাব্যের রচয়িতা, তাঁর কলমে রচিত হয় সার্থক সনেট, আবার গীতকবিতার সুরঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হয়েছে তাঁরই কবিতায় -- সেই মহৎ স্রষ্টার প্রতিভার ব্যাপ্তি ও বিচ্ছুরণ পাঠককে ভাবায়,স্তব্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করে- 'বাংলার রেনেসাঁসের সার্থক প্রতিনিধি মধুসূদন দত্ত। নবযুগের উল্লাস ও বেদনার সর্বাধিক গভীর প্রতিফলন তাঁর কাব্য - কবিতায়। নতুন মানবতার তিনি মুক্তিদাতা,মধ্যযুগের অন্ধ তমসাগর্ভ থেকে আলোকোজ্জ্বল নতুন পৃথিবীতে পদার্পণ তারই পদচিহ্ন ধরে। বাংলা সাহিত্যের কালবদল, জাত বদলের পুরোধা তিনিই। তিনি একাই একটা বিশিষ্ট যুগ'। ১

মধুসূদনের আবির্ভাবকে উনিশ শতকের বাংলাদেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলার সমাজ - সংস্কৃতির নানা দিকে তখন দেখা গেছে রামমোহন রায়ের গভীর প্রভাব। দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-চেতনার বিস্তার, ধর্ম-সাহিত্য-সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা দিকে দেখা গেছে রূপান্তর। আর বাঙালির মনে অসামান্য ছাপ ফেলেছিল নবজাগ্রত মানসিকতা ও চিন্তাধারা, বিকশিত হচ্ছিল মানবতাবোধ। এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের আনন্দকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল নবজাগ্রত বাঙালি-মানস। দেখা গেছে সৃজন এর নানা দিকে এসেছে বিপুল পরিবর্তন, এই নতুন যুগের ভোরে। দেখা যায় যে কোন দেশে বা কালে সমসাময়িক যুগ-প্রতিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে মহৎ ও বৃহৎ প্রতিভার আবির্ভাবের ক্ষেত্রে। আবার একথাও সত্যি যে,-' মধুসূদন যুগন্ধর, কিন্তু মধুসূদন যুগাতিশয়ী শক্তির অধিকারী। এই শক্তির আবিষ্কারের মধ্যেই তার কবি-আত্মার প্রকৃত পরিচয় লুক্কায়িত।যে শক্তিতে তিনি যুগন্ধর ও চিরকালীন, সেই শক্তির উৎস নিশ্চয়ই কেবল যুগের সত্যে নয়, ব্যক্তির সত্যেও। ২

বাংলার জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে মধুসূদনের আবির্ভাব। আসলে মধুসূদন উপলব্ধির সমগ্রতা

দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নবজাগরণের মর্মসত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, আর শিল্পরূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন আপন উপলব্ধিজাত সত্যকে। মধুসুদনের হাতেই আবিষ্কৃত হয় বাংলা কাব্য সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি আর তা প্রকাশিত হয় আধুনিক ভাব-ভাবনা নিয়ে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রয়াস বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সবধরনের ভাব প্রকাশের উপযোগী ও শক্তিশালী করে তুলেছিল, কিন্তু বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন প্রতিভাধর স্রষ্টার তখনো আবির্ভাব ঘটেনি - যিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রবাহিত করে তুলবেন পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্য, মেলাবেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে। আসলে বাংলা সাহিত্য যেন ছিল কোন প্রতিভাধর কবিব্যক্তিত্বের আবির্ভাব-প্রতীক্ষায়, যিনি আসবেন নতুন সাহিত্যরস সৃষ্টি ও উপলব্ধির সহজ শক্তি নিয়ে।

মধুসূদন বাংলা কাব্যসাহিত্যে উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন নবজাগরণের উপযোগী মানবচেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব অসাধারণ প্রতিভা নিয়েই। মধুসূদনের মধ্যে একদিকে যেমন দেখা যায় নবজাগরণের উদ্দীপনা উচ্ছ্বাস আর সাথে যৌবনের তীব্র প্রকাশ, অন্যদিকে তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সুগভীর প্রত্যয়, যেখানে স্রষ্টা মধুসূদন নিষ্ঠাবান সারস্বত সাধক, দায়িত্ববান শিল্পী। প্রতিভা, সাধনা আর আত্মশক্তির ওপর অগাধ আস্থা নিয়ে মধুসূদন আপন মাতৃভাষাকে ভাববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে তোলেন, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে।

মধুসূদন তৈরি করে দিয়েছিলেন 'আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ'।৩ হঠাৎ করেই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব - আর তা কবি হিসেবে নয়, প্রথমে নাট্যকার হিসেবেই। মাদ্রাজে অবস্থানকালীন মধুসূদন 'Rizia' নামে ইংরেজি নাটক রচনা করেছিলেন। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে স্রষ্টা মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন কিছুটা আকস্মিকভাবেই। মধুসূদনকে খুশি করতে পারেনি, বরং হতাশই করেছিল, বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত রত্নাবলীর অভিনয়-যেখানে তিনি ছিলেন আমন্ত্রিত। এর ফলশ্রুতিতে মধুসূদনের হাত থেকে বেরিয়ে এলো 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটক। এটি পৌরাণিক নাটক। কাহিনির বিষয়বস্তু সংগৃহীত মহাভারতের যযাতি-দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কাহিনি থেকে। এর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হল প্রথম যথার্থ আধুনিক বাংলা নাটকের।

এর পরের সৃষ্টি 'পদ্মাবতী'ও (১৮৬০) পৌরাণিক নাটক। এ নাটকের ভিত্তি গ্রীক পুরাণের পরিচিত 'Apple of Discord' গল্প, যাকে তিনি সাজিয়ে নিয়েছেন ভারতীয় রূপে। মধুসূদনের আশ্চর্যজনক সৃজনক্ষমতার পরিচয় ধরা রয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-প্রহসন দুটির মধ্যে।

মধুসূদন ভাষারীতিতে, বিশেষ করে কথ্যরীতিতে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোট ছোট চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে জীবন্ত। সংলাপ রচিত হয়েছে চরিত্র অনুসারে - যার ফলে তা হয়েছে সার্থক

ও প্রাণবন্ত, দেখা যায় কথ্যভাষার যথাযথ ব্যবহার। মধুসূদন তাঁর প্রহসনে অপরূপ দক্ষতায় যে জীবন ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন এবং যে অসাধারণ লোকচরিত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন , তা তাঁর অনন্য কীর্তি বলেই পরিগণিত হবে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি, এটি ঐতিহাসিক ট্রাজেডি, কাহিনির পরিসমাপ্তি সুতীব্র বেদনায় ,নাটকের পরিণামে তাই ধ্বনিত 'ট্রাজেডির হাহাকার'। কাহিনি প্রধানত ইতিহাস (কর্নেল টডের Annals and Antiquities of Rajasthan) থেকে নেওয়া।

শেষ রোগশয্যায় মধুসূদনের হাত থেকে বেরিয়ে আসে আরেকটি সৃষ্টি 'মায়াকানন', প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যার মধ্যে বেজেছে এক 'সর্বনাশের সুর'। নাট্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তির দিকে আমরা তাকাতে পারি-'... বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম ভালো নাটক লিখেছেন। তার চেয়েও বড় কথা হল বাংলা নাট্য সাহিত্যের মুক্তির পথটি তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেখিয়ে দিয়েছেন। ৪

নতুন যুগের বাংলা কাব্য-কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা মধুসূদনের হাতেই। মধুসূদনের মধ্যে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা। প্রকাশিত হয় 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে লেখা মধুসূদনের ইংরেজি কাব্য, 'A vision of the Past - Captive Ladie' (Madras Circulator পত্রিকায়)। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত যশ মিলল না। মাদ্রাজে, বন্ধু গৌরদাস বসাকের চিঠি - মতামত মধুসূদন পেলেন, জানলেন জে. ই. ডি. বেথুন সাহেবের মন্তব্য। এবার সাধনা শুরু হল মাতৃভাষায়, এল অমিত্রাক্ষর ছন্দ - 'মাইকেল যেন বাজি ধরেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনার প্রয়াস করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন সেকেলে পয়ার ছন্দের আট + ছয় যতিবন্ধনে বন্দী ভাবধারাকে মুক্তি দিতে হলে সর্বপ্রথম পয়ারের ছেদ-যতির গতানুগতিক ও কৃত্রিম বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে কাব্য পংক্তিকে ভাবের আবেগে ছেড়ে দিতে হবে। ভাবানুসারে যতিপাত হবে, ছন্দের কৃত্রিম বাঁধনে নয়।

এই হল বাংলা ছন্দের প্রথম মুক্তি, অর্থাৎ কৃত্রিম ছন্দবন্ধন থেকে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুক্তি। ...অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ ছন্দকার রূপে মাইকেল বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন'। ৫

প্রকাশিত হয় মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০)। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ এখানে দেখা গেছে । চার সর্গে বিভক্ত এই কাব্যের কাহিনি -উৎস মহাভারত ও পুরাণ।

এর পরের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) - এটি এক অনন্য সৃষ্টি। নয় সর্গে রচিত এই মহাকাব্য, 'মেঘনাদবধ কাব্যের' কাহিনির ঘটনাকাল তিন দিন, দু রাত্রি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের অমর কবি কীর্তি, এ কাব্যের নবসঙ্গীতময় ছন্দে ধরা পড়েছে মধুসূদনের 'কবিসত্তা'। উনিশ শতকের নবজাগ্রত প্রাণসত্তার অনন্য, দুর্দমনীয় প্রকাশ দেখা যায় 'মেঘনাদবধ কাব্যের' মধ্যে। প্রাচ্য ও পাশ্চত্য ভাবধারার সম্মিলন ঘটেছে মধুসূদনের এই কালজয়ী সৃষ্টিতে। কাব্যের

প্রথমদিকে মধুসূদন 'গাইব, মা বীররসে ভাসি,/ মহাগীত.....' লিখলেও কাব্যের অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে করুণ রস। রাবণ-পুত্র 'মেঘনাদ' মধুসূদনের মানস-সন্তান। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গের শুরু রাবণের অন্যতম সন্তান বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে, আর মহাকাব্যের সমাপ্তিতে নবম সর্গে দেখা যায় মৃত মেঘনাদের চিতায় তার স্ত্রী প্রমীলার মৃত্যুবরণ। 'সিন্ধুনীরে' স্নান সেরে রাক্ষসরা লঙ্কায় ফিরেছে অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে-'সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'।

মধুসূদনের আর এক অভিনব সৃষ্টি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১)'..... প্রায় মেঘনাদবধের সমকালেই 'ব্রজাঙ্গনা' লেখা চলেছিল এবং প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হলে পাঠকের বিস্ময়ের ঘোর দ্বিগুণ হল। মেঘনাদবধের তূর্যধ্বনি এবং ব্রজাঙ্গনার বংশীধ্বনি যিনি একই সঙ্গে করতে পারেন, তাঁর প্রতিভা যে একটু বিচিত্র ধরনের তাতে কোন সন্দেহ নেই।' ৬

সমালোচকের মতে 'রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনি নিয়ে 'ওড্' জাতীয় কাব্যসৃষ্টি, 'ব্রজাঙ্গনা'র পরিকল্পনা', মধুসূদনের ভাবনায় স্থান পেয়েছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য' সৃষ্টির আগে থেকেই। এই কাব্যে অভিব্যক্ত বিরহিণী 'রাধার মর্মব্যথা', মানবিক দিকটুকু ছিল মধুসূদনের পছন্দের, বৈষ্ণবসাহিত্যের রসতত্ত্ব বা ভক্তির দিক নয়। ব্রজের রাধা এখানে উপস্থাপিত মানবী রূপেই, কাজ করেছে স্রষ্টার আধুনিক মানবীয় দৃষ্টিকোণ।

এর পরবর্তী মধুসূদনের সৃষ্টি 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২), এটি পত্রকাব্য। মোট এগারোটি পত্র এতে রয়েছে। রোমান কবি ওভিদের 'Heroides' এর আদর্শে এ কাব্য সৃষ্টি। স্রষ্টা মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য'কে করে তুলেছেন এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যেখানে বিষয়ের দিক থেকে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় পুরাণ - মহাকাব্যকে, কাব্যাদর্শ গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্ত্য পত্রকাব্য থেকে, আর এর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন নবজাগরণের জীবন-ধর্ম। এগারোটি চিঠির মধ্যে দিয়ে কবি ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য, নাটক থেকে নানা নারীচরিত্র বেছে নিয়ে, তাদের লেখা কল্পিত পত্রের মধ্যে দিয়ে বিচিত্ররূপিণী নারীর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বীরাঙ্গনাকাব্যে'র মধ্যে কবি যেন রচনা করলেন ব্যক্তিত্বময়ী নারীর জাগরণের উদ্বোধন মন্ত্র, যখন নবজাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত নারী একটু একটু করে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে চলেছে আলোর দিকে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) মধুসূদনের শেষ কাব্য, যা পাশ্চাত্ত্য সনেটের আদর্শে রচিত - 'অনেক অভিনব কাব্যরীতির' মত, বাংলা সনেটেরও তিনি উদ্ভাবয়িতা এবং বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকার'[৭]। পেত্রার্কা, শেক্সপীয়র প্রভৃতিদের আদর্শে মধুসূদন তার সনেটকে গড়ে তোলেন। সনেটের অনেকগুলিই বিদেশে থাকাকালীন রচনা। বিদেশে নানা ভাবে তাকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল। এই যন্ত্রণাময় পরিস্থিতিতে দুরবস্থার মধ্যে তিনি অনেকগুলি সনেট লেখেন বিদেশী সনেটের আদর্শে। সনেট রচনা বেশ কঠিন। এখানে একদিকে যেমন চোদ্দ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় কবি কল্পনাকে, আবার তেমনি পংক্তিগুলির মিলের বিন্যাসের 'বাঁধাবাঁধি রীতি অনুসরণ করে' বজায় রাখতে হয়

কবিতার স্বাভাবিকতা – যা দুরূহ কাজ, আর তা সম্ভব হয়েছে মধুসূদনের প্রতিভার শক্তিতে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, হতাশা যখন নিয়ত দগ্ধ করেছে, অবাক হয়ে আমরা লক্ষ্য করি সেই পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করে চলা সনেটগুলি শিল্পময়তায় ভাস্বর, প্রায় ত্রুটি বিচ্যুতিশূন্য। বিদেশে শারীরিকভাবে থাকলেও মন ব্যাকুল স্বদেশের জন্য – জন্মভূমি বাংলার নদ-নদী, আকাশ-বাতাস সবকিছুর জন্য।

জীবনের শেষবেলায় প্রকাশিত হয় মধুসূদনের একটি গদ্য আখ্যান 'হেক্টরবধ'।

ইউরোপীয় ক্লাসিক ও আধুনিক ভাষায় যিনি দক্ষ, অসাধারণ যার প্রতিভা, যিনি অতুলনীয় মানসিক শক্তির অধিকারী, তার জীবন কাহিনি নাটকীয়। ১৮২৪ এর ২৫এ জানুয়ারি শনিবার রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর সন্তান মধুসূদন দত্তর জন্ম যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে, যা কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী। আর এই মহান প্রতিভার হাত ধরেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হল নবজীবন লাভ, এলো 'আধুনিকতার সঞ্জীবনী প্রবাহ'। বাল্যকাল থেকে মধুসূদনের মধ্যে দেখা গেছে কাব্যপ্রীতি ও অধ্যয়ন স্পৃহা। খুব কম বয়সেই মায়ের কাছ থেকে শোনা, রামায়ণ- মহাভারত মধুসূদনকে তন্ময় করে দিত। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা-শেষে মধুসূদনের কলকাতায় আসা। হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন রিচার্ডসন। এই সাহিত্যসমালোচক কবি-অধ্যাপকের স্নেহ- সান্নিধ্য মধুসূদনকে, সাহিত্যকে ভালোবেসে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশের পথ দেখালো। মধুসূদনের সামনে কল্পনার জগতের পথ খুলে দিলেন অধ্যাপক রিচার্ডসন। মধুসূদনের জীবনে কার্যকরী হয়েছিল আর এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ডিরোজিওর প্রভাব ও শিক্ষা। যদিও ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তারপর মধুসূদনের হিন্দু কলেজে প্রবেশ। ডিরোজিও ছাত্রমহলে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১৮৪২ এ মধুসূদন পান 'জুনিয়র স্কলারশিপ'। এ সময়ে তাঁর ইংরেজিতে লেখা কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে - এই প্রকাশের ক্ষেত্রেও ছিল রিচার্ডসনের আনুকূল্য। বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন যুগ আনবেন, হবেন যুগপ্রবর্তক সাহিত্য-স্রষ্টা, তিনি প্রথমদিকে বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা দেখান। বাসনা জাগে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে খ্যাতি লাভের। তাকে আকর্ষণ করে বিজাতীয় ভাব ও আদর্শ, স্বপ্ন দেখেন বিলেতে যাওয়ার। ১৮৪৩ এর ৯ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতি হিন্দু কলেজ ছেড়ে বিশপস্ কলেজে ভর্তি হওয়া।

১৮৪৪ এর নভেম্বরে মধুসূদন ভর্তি হন বিশপস্ কলেজে। বিশপস্ কলেজের বিশেষ ভূমিকা ছিল মধুসূদনের ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে। বাল্যকালের সাগরদাঁড়ির জীবনের মতো হিন্দু কলেজ ও বিশপস্ কলেজ, স্রষ্টা মধুসূদনের জীবনে নিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এরপর মধুসূদনের মাদ্রাজ-যাত্রা। মাদ্রাজ বসবাসকালীন চলেছিল অনাথ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন। মাদ্রাজে থাকাকালীন চব্বিশ বছরের মধুসূদনের সঙ্গে সতেরো বছরের মেয়ে রেবেকার বিয়ে হয়। সাহিত্যচর্চা চলেছে, প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায় লেখা কাব্য। ইংরেজিতে লেখা কাব্য তাঁকে কাঙ্ক্ষিত যশ দেয় নি– অনুরাগী হিতৈষী বন্ধুদের কাছ থেকে এসেছে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার পরামর্শ।

মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন কলকাতায় ফেরেন ১৮৫৬ এর ২রা ফেব্রুয়ারি। সেখানে রইল রেবেকা ও শিশুসন্তানেরা। এর পরবর্তী সময়ে অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে মধুসূদনের জীবনে আসেন হেনরিয়েটা। কলকাতায় ফিরে পুলিশকোর্টে কেরানীগিরি - দোভাষীর কাজ করেছেন। বাংলা ভাষায় কাব্য ও নাটক রচনায় বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি, সূত্রপাত করেছেন সাহিত্যে নবযুগের। এরপর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যাত্রা, বিলেতে যাবার স্বপ্ন তো ছিল মধুসূদনের অনেকদিনের। মধুসূদন ১৮৬২ এর ৯ই জুন 'ক্যাণ্ডিয়া' জাহাজে করে বিলেতে যাত্রা করেন, ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলেন জুলাই মাসের শেষে। মধুসূদন প্রবাস- জীবনে খুবই অর্থকষ্টে পড়েছিলেন, বিপদ থেকে উদ্ধারে অগ্রণী হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মধুসূদন। ১৮৬৭তে দেশে ফেরেন তিনি। হাইকোর্টে ব্যারিস্টারিতে প্রবৃত্ত হলেও এলো না আশানুরূপ সাফল্য। ১৮৬৭ তে কলকাতায় পৌঁছে একাই ওঠেন 'স্পেনসেস' হোটেলে। আয় ব্যয়ের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনে প্রয়াসী হলেন না। ১৮৬৯ এ মধুসূদন, স্ত্রী হেনরিয়েটা ও তাদের পুত্র কন্যাদের নিয়ে বাসা নিলেন লাউডন স্ট্রীটে। মধুসূদনকে মামলা উপলক্ষে বাইরেও যেতে হয়। এর মাঝে ঢাকায় গিয়ে সংবর্ধিত হন, পুরুলিয়াও গেছিলেন এক মামলা উপলক্ষে ১৮৭২ এ। মধুসূদন কলকাতায় থাকছেন। গুরুতর অসুস্থ কবির জীবন ভরে উঠেছিল রোগ আর ঋণের যন্ত্রণায়। মাঝে মাঝে মধুসূদন উত্তরপাড়ার গঙ্গার ধারের বাড়িতে গিয়ে বাস করেছেন জয়কৃষ্ণ মুখার্জির আহবানে, ১৮৭৩ এর জুন মাসের শেষের দিকে মধুসূদনকে ভর্তি করা হয় আলিপুর জেনারেল হসপিটালে। মধুসূদন বুঝে ফেলেছিলেন পৃথিবী থেকে তার বিদায় এর দিন খুবই নিকটবর্তী, নিজেই লিখে ফেললেন নিজের সমাধি-লিপি।১৮৭৩ এর জুনে মধুসূদন পাড়ি দিলেন চির না-ফেরার দেশে, তাঁকে সমাহিত করা হল কলকাতার পার্কসার্কাসে, খ্রিস্টানদের সমাধি'ক্ষেত্রে।

উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাসের এক মহালগ্নে মধুসূদনের আবির্ভাব। এই অমর স্রষ্টার জন্মের পর দুশো বছর কেটে গেছে। মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণে, এক মহান ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। তিনি ঘটিয়েছেন পূর্ব-পশ্চিমের অপরূপ মিলন। মধুসূদনের আবির্ভাবকালে বাংলা সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব। প্রাচ্যের সাহিত্য-ধর্ম-সমাজ-রীতিনীতির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সূচিত হয় পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভাবনার সঙ্গে সংঘর্ষে। দেখা যায় বিভিন্ন দিকে পূর্ণ বেগে পরিবর্তন, পরিবর্তন আসে বাঙালির প্রবণতা ও রুচিতে, বাঙালি নতুন উৎসাহে উদ্বোধিত হয়ে ওঠে, নতুন আশা -আকাঙ্ক্ষায়।

অল্প কয়েক বছরের সাহিত্য সাধনায় বাংলা সাহিত্যকে এই অনন্য প্রতিভাধর স্রষ্টা যা দিয়ে গেছেন তা তুলনাহীন, বাংলা সাহিত্যকে সীমাহীন ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী করে গেছেন মধুসূদন। অবাক করে দেয় এই মানুষটির অল্প সময়ের মধ্যে কি দুরন্ত সাধনা, আর সাহিত্যে তার কি অপরূপ প্রকাশ। কি অতুলনীয় মানসিক শক্তির অধিকারী তিনি, আত্মশক্তির ওপর তাঁর কি সুগভীর আস্থা।

কি কাব্যে, কি নাটকে মধুসূদনের লেখনি ভরিয়ে তুলেছে বাংলা ভাষাকে, করেছে মাতৃভাষার অসাধারণ উৎকর্ষ সাধন। মধুসূদনের হাতেই বাংলা সাহিত্যের নবজীবন লাভ – পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে, বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের যথাযথ সম্মিলন। লেখা হয়েছে নতুন ধারায় মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য, এসেছে পত্রকাব্য, গীতিকবিতা, সনেট। তাঁর হাত থেকেই বেরিয়ে এসেছে সার্থক নাটক-প্রহসন। মধুসূদনের জন্মের দুশ বছর পার হয়ে গেলেও পাঠককে আজও অবাক বিস্ময়ে তাঁর জীবন ও সৃষ্টির দিক তাকিয়ে থাকতে হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ক্ষেত্র গুপ্ত ঃ 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প', তৃতীয় সংস্করণ, কার্তিক ১৩৮২ পৃঃ ১

২। ঐ পৃঃ ১-২

৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৪- ২০০৫ পৃষ্ঠা ৩৪৪

৪। ক্ষেত্রগুপ্ত ঃ বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা ৭০০০০৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০২, নভেম্বর, পৃঃ ২৭৮

৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০৭৩, ২০০৪ -২০০৫, পৃঃ ৩৭০-৩৭১

৬। ঐ, পৃঃ ৩৭৬

৭। ঐ, পৃঃ ৩৮১

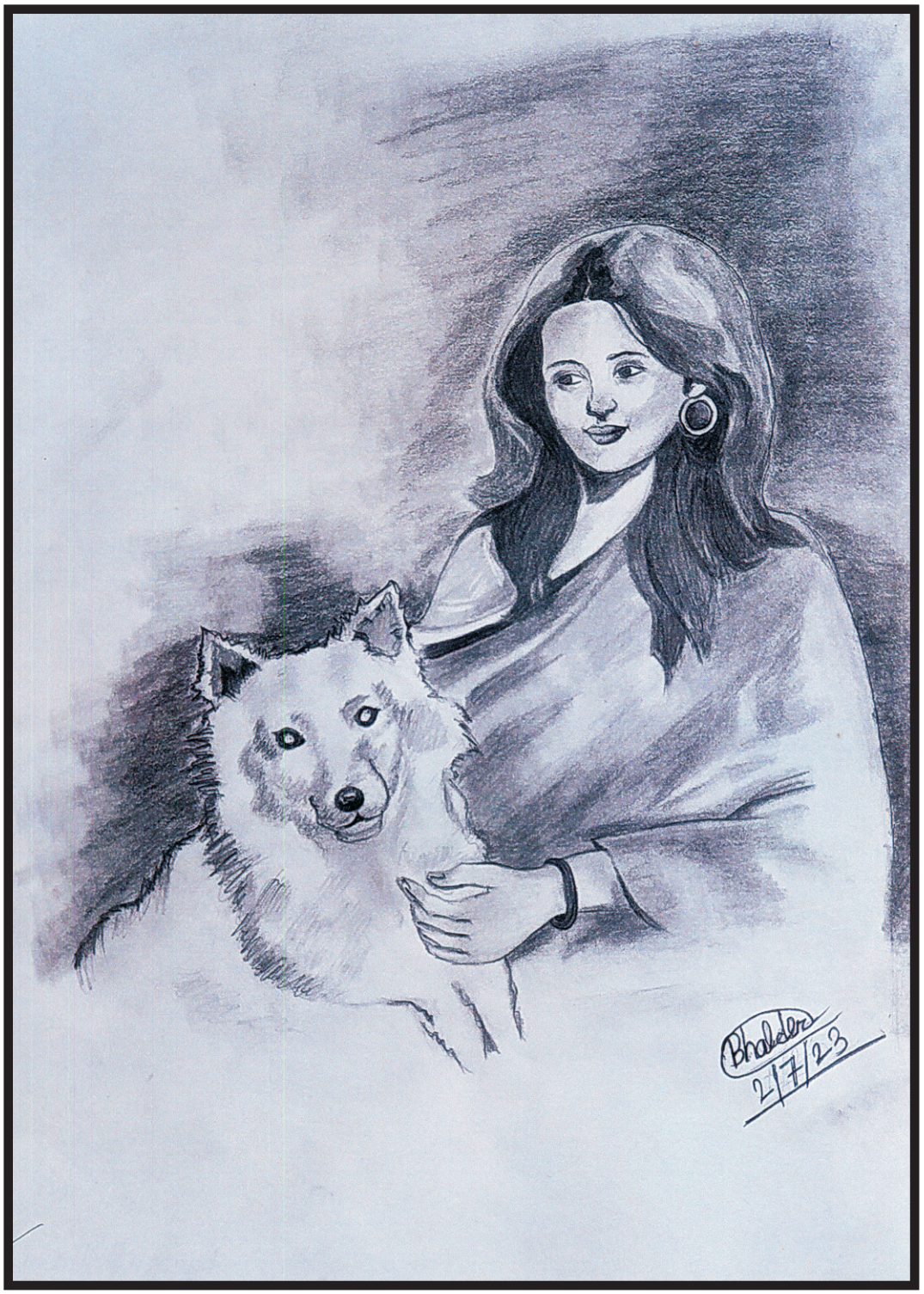

Barnali Halder, Mathemetics Hons. 3rd Semester

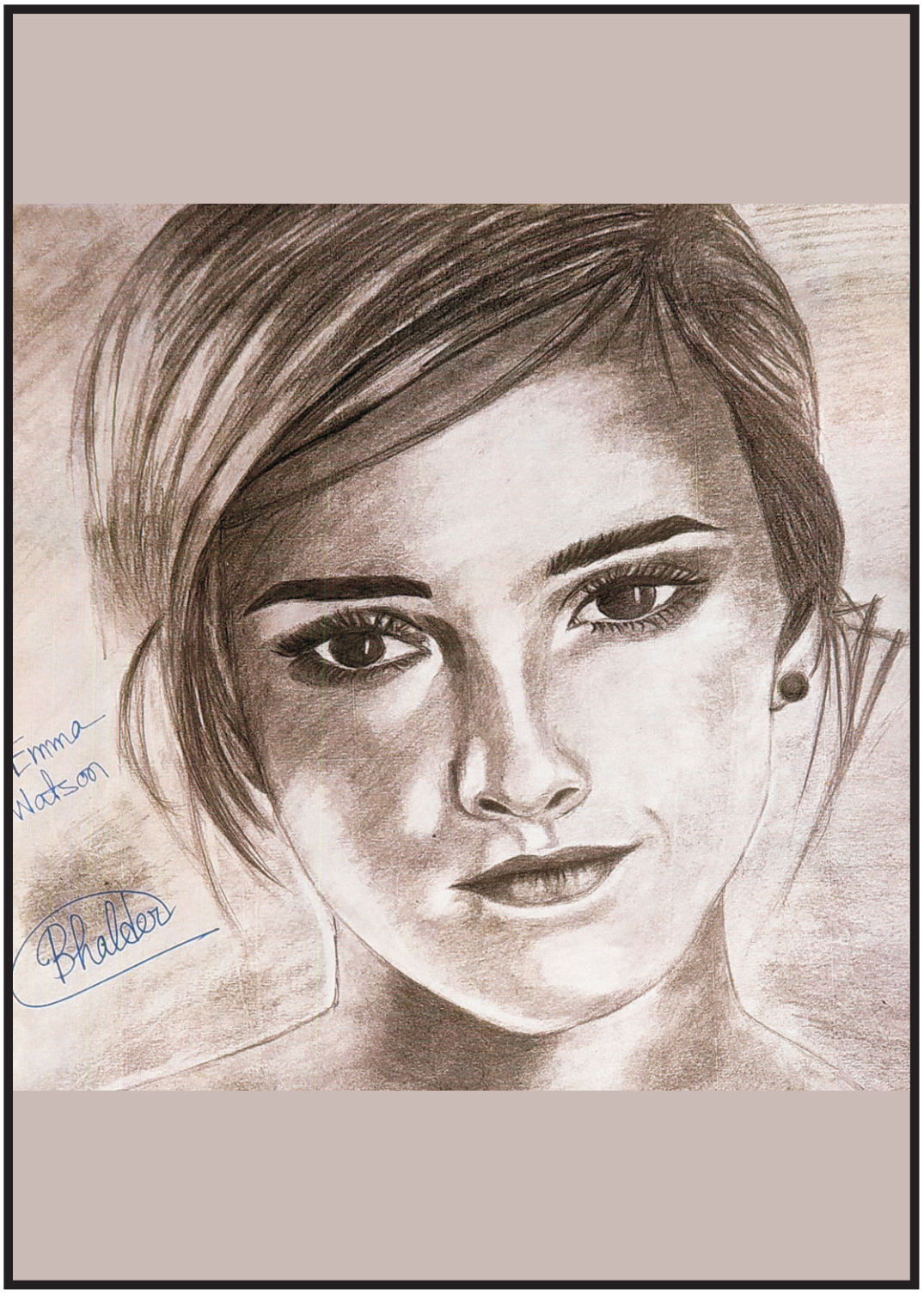

Barnali Halder, Mathemetics Hons. 3rd Semester

Suparna Biswas, 1st Semester

Pratishruti Bhattacharya, English Hons. 6th Semester

Sneha Jaiswal, Physics (Hons) 1st Semester

Hotree Dey, Music Department, 3rd Semester